গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭০ বর্ষ ১০ সংখ্যা ২০ - ২৬ অক্টোবর ২০১৭ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

ধন্য ‘বিকাশ পুরুষ’!

ক্ষুধার্ত মানুষের ‘বিকাশ’ ঘটছে ভারতে

কয়েকদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন যারা দেশের সুদিন আসা নিয়ে সন্দিহান তারা সব নৈরাশ্যবাদীর দল। প্রধানমন্ত্রী বলেননি আশার আলো দেখছে এই ভারতের কোন মানুষগুলি? তারা কি মেক ইন ইন্ডিয়ার নামে অস্ত্র কারখানার বরাত খুলে যাওয়া আম্বানি, টাটা, আদানিদের দল? বিশ্ব বাজারে তেলের দাম কমে যাওয়া সত্ত্বেও ভারতে তেল-গ্যাসের দাম বাড়িয়ে রেখে প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি সরকার যে ধনকুবের গোষ্ঠীদের ফুলে ফেঁপে উঠতে সাহায্য করছেন, তারা? নোট বাতিলের সুযোগে সরকারি বদান্যতায় যে সব নেতা-মন্ত্রীদের ছেলেপিলে বা ঘনিষ্ঠদের ব্যবসা কয়েক মাসে ১৬ হাজার গুণ বৃদ্ধি পায়, তারা? নাকি নোট বাতিলের ধাক্কায় কাজ হারানো কয়েক লক্ষ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, কিংবা জিএসটির খেলায় এক বড় পুঁজির কাছে ব্যবসা খুইয়ে গলায় দড়ি দিতে চাওয়া ছোট ব্যবসায়ীর দল? নাকি আত্মহত্যার সারিতে দাঁড়ানো সর্বস্ব হারানো কৃষককুল? প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই জানেন, গরিব, মধ্যবিত্ত ঘরে আজ আলোনয়— জ্বলে ক্ষুধার গনগনে আগুন। যে কারণে তথাকথিত ভাইব্র্যান্ট গুজরাটে ভোটের আগে তাঁকে প্রতিশ্রুতির কল্পতরু সেজে মানুষের ক্ষোভ সামলাতে ছুটতে হচ্ছে দোরে দোরে। কিন্তু তাঁর স্বীকার করবার উপায় নেই, যে ধনকুবেরদের পয়সায় তাঁর ভোটের প্রচার, ১০ লাখ টাকার কোট, রংবাহারি ডিজিট্যাল প্রচার চলে, তাদের সেবা করতেই তো তিনি গদিয়ান হয়েছেন!

১২ অক্টোবর সামনে এল এই ভারতের এক মর্মান্তিক চিত্র। আন্তর্জাতিক সংস্থা জানিয়েছে বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান প্রায় সবার পিছনে। ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আইএফপিআরআই) বিশ্বের যে ১১৯টি উন্নয়নশীল এবং দরিদ্র দেশকে নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যার ভিত্তিতে তালিকা করেছে তাতে প্রধানমন্ত্রী কথিত ‘আলোকোজ্জ্বল’ ভারতের স্থান ১০০। কেবলমাত্র ইথিওপিয়া, চাদ, নাইজেরিয়ার মতো দুর্ভিক্ষ পীড়িত ও জাতিদাঙ্গায় বিধ্বস্ত কয়েকটি দেশের উপরে স্থান পেয়েছে ভারত। ভারতের সাথে খুব কাছাকাছি আছে দক্ষিণ সাহারা মরুভূমি সংলগ্ন ক্ষুধাপীড়িত কয়েকটি দেশ। এমনকী প্রতিবেশী

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যে ভয়াবহ ডেঙ্গি আক্রমণ

সরকার বলছে ‘সব ঝুট হ্যায়’

রাজ্যের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত— মানুষকে তাড়া করছে ডেঙ্গির ত্রাস। হাসপাতালগুলিতে রোগীর ঢল। বিশেষ করে দেগঙ্গা ও হাবড়া সহ উত্তর ২৪ পরগণার গ্রামীণ এলাকাগুলিতে ঘরে ঘরে জ্বরগ্রস্ত মানুষ। কলকাতার বেশ কিছু ওয়ার্ড, দমদম, বিধাননগর ইত্যাদি অঞ্চলের পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। সন্তানের মৃতদেহ আঁকড়ে হাহাকার করছেন মা, হাসপাতালের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন রোগী। অসংখ্য রোগাক্রান্ত মানুষের ভিড়ে দিশাহারা চিকিৎসকরা। আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে মানুষ।

ডেঙ্গি দমনে সরকারি ব্যর্থতার প্রতিবাদে ১২ অক্টোবর বারাসাতে এসইউসিআই(সি)-র বিক্ষোভ

পাঁচের পাতায় দেখুন

নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তি সমাবেশে

১৭ নভেম্বর শহিদ মিনার ময়দান চলুন

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আগামী ১৭ নভেম্বর শহিদ মিনার ময়দানে সমাবেশের ডাক দিয়েছে এসইউসিআই (সি)। একশো বছর আগে ১৯১৭ সালে ৭-১৭ নভেম্বর দুনিয়া কাঁপানো দশদিনে মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে বুর্জোয়া শ্রেণির হাত থেকে ক্ষমতা দখল করেছিল রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণি। যে বিপ্লব শারিয়ার শ্রমিকশ্রেণিকে নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছিল। কৃষি, শিল্প সহ সমাজের সমস্ত কিছুর বিপুল অগ্রগতি ঘটেছিল। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের মূলোৎপাটন করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। মহান মার্কস ও এঙ্গেলসের পথনির্দেশ, যা আমাদের কাছে মার্কসবাদ নামে পরিচিত, তাকে হাতিয়ার করে বিজয় অর্জন করে এক যুদ্ধ-বিধ্বস্ত, দুর্ভিক্ষ পীড়িত, অত্যন্ত পশ্চাৎপদ এই দেশকে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নীত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন লেনিন ও তাঁর দল বলশেভিক পার্টি।

তৎকালীন রাশিয়ায় শ্রমিকদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। অত্যন্ত নিম্নমজুরি, পূঁতিগন্ধময় বস্তিজীবন, অশিক্ষা, জীবনের দুঃখ ভুলে ভদ্‌কায় বুঁদ হয়ে থাকা— এ ছিল শ্রমিক জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষির অবস্থাও ছিল তেমনই। ভরপেট খাওয়া তার জুটত না, কৃষি অত্যন্ত পশ্চাদপদ। চাষের পশুর অবস্থা তার চেয়েও শোচনীয়। খাজনা দেওয়া, চাষের জন্য পশু কেনা, কাঠের লাঙল মেরামত করা আর রুটি জোগাতে তার সামর্থ্য ছিল শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্পের গফুরের মতো। বেঁচে থাকার তাদের উপায় ছিল একটাই— নিরুপায় হয়ে নিরন্ন

থাকার কৃচ্ছ্রসাধন। সমাজে শ্রমিক-চাষির অবস্থা যখন এরকম, তখন নারীর জীবন কী অসহনীয় হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

এমনই দারিদ্র-পীড়িত, সামন্তী জারের দাপটে নুয়ে পড়া, নিরক্ষর, ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অনৈতিক জীবনে অভ্যস্ত শ্রমজীবী মানুষ উন্নত আদর্শ ও নৈতিকতায় বলীয়ান হয়ে মহা শক্তিশালী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লব করে ক্ষমতা দখল করতে পারে তা প্রমাণ করে দিয়েছিল নভেম্বর বিপ্লব। একটা অত্যন্ত পশ্চাদপদ বিশালায়তনের দেশ অশিক্ষা, দারিদ্র, বেকারি, হতাশা, অনৈতিক জীবন দূর করে সকলের জন্য খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ, আধুনিক শিল্প, অত্যাধুনিক কৃষি ও দেশজুড়ে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে এক সুন্দর স্বপ্নের দেশ গড়ে তুলতে পারে, রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

এই সমাজতন্ত্রের রূপ কী, তা দেখতে রাশিয়ায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমিক-জীবন— বহু কিছু নিয়েই তিনি লিখেছেন। তাঁকে অভিভূত করেছিল জনগণের সবচেয়ে পশ্চাদপদ অংশ চাষির জীবনের পরিবর্তন। সে দেশের চাষির জীবনের বিপুল অগ্রগতি দেখে তিনি লিখেছিলেন— “নিজেদের দেশের চাষি মজুরদের কথা মনে পড়ল। মনে হল আরব্য উপন্যাসের জাদুকরের কীর্তি। বছর দশেক আগেই এরা ঠিক আমাদেরই

দুয়ের পাতায় দেখুন

১৭ নভেম্বর শহিদ মিনার ময়দান চলুন

একের পাতার পর

দেশের জনমজুরদের মতোই নিরক্ষর, নিঃসহায় ও নিরন্ন ছিল। তাঁদেরই মতো অন্ধ কুসংস্কার এবং মূঢ় ধার্মিকতা। দুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়েছে, পরলোকের ভয়ে পাণ্ডা পুরুতদের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা, আর ইহলোকের ভয়ে রাজপুরুষ মহাজন ও জমিদারদের হাতে, যারা এঁদের জুতোপেটা করত, তাদেরই সেই জুতো সাফ করা এঁদের কাজ ছিল। কয়েক বছরের মধ্যে এই মূঢ়তার অক্ষমতার পাহাড় নড়িয়ে দিলে যে কী করে সে কথা এই হতভাগ্য ভারতবাসীকে যেমন একান্ত বিস্মিত করেছে এমন আর কাকে করবে বল?

দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার চাষিরা ভারতবর্ষের চাষিদের কত বহু দূরে ছাড়িয়ে গেছে। কেবল বই পড়তে শেখেনি, ওদের মন গেছে বদলে, ওরা মানুষ হয়ে উঠেছে। শুধু শিক্ষার কথা বললে সব কথা বলা হল না, চাষের উন্নতির জন্য সমস্ত দেশ জুড়ে প্রভূত উদ্যম সেও অসাধারণ।"

সেদিন রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব ও তার ফলাফল শুধু সে দেশের শ্রমিক-কৃষকের জীবনে সমৃদ্ধি নিয়ে আসেনি, সর্বপ্রকার শোষণ মুক্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের লুণ্ঠনের ক্ষেত্রটিকেও সে সংকুচিত করেছিল। নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাবে সেদিন প্রতিটি পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশে শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনে আরও বেশি প্রত্যয় নিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের স্লোগান তীব্র হয়ে উঠেছিল।

আকাঙ্ক্ষিত পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য চলিয়েছিল বে-নজির অর্থনৈতিক অসহযোগিতা, কুৎসার বন্যা, প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত, সামরিক অভিযান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী হিটলার সোভিয়েত ব্যবস্থাকে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য কোনও রকম নিয়ম-কানুন, আন্তর্জাতিক রীতিনীতি, নৈতিকতা না মেনে আক্রমণ করেছিল সোভিয়েত রাশিয়াকে। এই আক্রমণের পেছনে মদত ছিল দুনিয়ার প্রায় সব বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির। সেই আক্রমণ ছিল এ-যাবৎকালের সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক, সবচেয়ে বেশি প্রাণঘাতী। বহু মূল্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর দেশকে পুনর্গঠন করে অতি অল্পদিনে কৃষিতে, শিল্পে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, বিজ্ঞানে, সংস্কৃতিতে, শিল্পকলায়, খেলাধূলায় বিশ্বের উচ্চ শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল সোভিয়েত দেশটি। যার নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড স্ট্যালিন। বিশ্বের কাছে এই সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে উঠেছিল এক নতুন বিস্ময়। শোষিত মানুষের দুই মহান নেতা লেনিন ও স্ট্যালিন সে দেশে বিপ্লবের পর মাত্র ৩৫ বছরের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন শোষণহীন ও সর্বব্যাপ্ত এক অত্যন্ত উন্নত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আর এই কাজের মধ্য দিয়ে তাঁরা রেখে গিয়েছেন সেই সমাজ গড়ে তোলার মহান শিক্ষাকে।

একশো বছর আগে ভারতের চাষি আর রাশিয়ার চাষির অবস্থা ছিল প্রায় একই রকম। বরং বলা ভাল, সে দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলির চাষিদের অবস্থা ছিল ভারতের প্রত্যন্ত এলাকার চাইতেও বহুগুণ বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। রাশিয়া নভেম্বর বিপ্লবের পর ৩৫ বছরে যা দিতে পেরেছিল, ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর তার দ্বিগুণ বছর ছাড়িয়ে গেল। এই ৭০ বছরে ভারতে চাষির জীবনের অবস্থা কী? পুঁজিবাদী শাসনে তাদের উপর কী ফল বর্তেছে? চাষের উপকরণের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বোঝা, খরা-বন্যায় ফসল নষ্ট হওয়া, ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া, ঋণভার বইতে না পারা চাষির আত্মহত্যার মিছিল। শুধু ১৯৯৫ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ২০ বছরে আত্মঘাতী কৃষকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার। আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচতে ফসলের নায্য দাম আর ঋণমকুব চাইলে রাজ্যে রাজ্যে ঘটছে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু। চাষি পরিবারের যুবকরা জমি হারিয়ে, ঘর সংসার, আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় প্রতিদিন কাজের খোঁজে ছুটছে এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে, পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে, যাপন করছে পরিযায়ী শ্রমিকের অনিশ্চিত জীবন। কাজের খোঁজে বেরিয়ে অনেকেই কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, তার খোঁজও কেউ রাখছে না। যার জমি নেই, তার জীবন যেমন অনিশ্চিত, তেমনি যে চাষির জমি আছে, তারও জীবনে নেই কোনও নিশ্চয়তা। এই হল বর্তমান গ্রাম-জীবনের বাস্তব চিত্র। চাষির উন্নতির হরেক রকম প্রতিশ্রুতি দেশনেতারা দিলেও স্বাধীনতার পর ৭০ বছরেও রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'তে বর্ণিত এদেশের চাষির হাহাকারের চিত্রটির কোনও পরিবর্তন হল না।

বাস্তবে কত প্রতিশ্রুতি কে দিচ্ছে তার উপর চাষির জীবনের উন্নতি নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুযায়ী কৃষি ব্যবস্থা চলছে তার উপর। আমাদের দেশে কৃষির কোনও উন্নতি হয়নি, ফলন বৃদ্ধি হয়নি— এটা ঘটনা নয়। উন্নতি হয়েছে খণ্ডিত, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে যার কোনও তুলনাই চলে না। কিন্তু উন্নতি যতটুকু হয়েছে, উৎপাদন বৃদ্ধি যা হয়েছে, কৃষকের জীবনে তার কোনও সুফলই বর্তায়নি। সমস্ত সুফল আত্মসাৎ করেছে এদেশের ধনী চাষি, গ্রামীণ পুঁজিপতি, বীজ কোম্পানি, সার-কীটনাশক উৎপাদক দেশি-বিদেশি কর্পোরেট মালিক, কৃষিপণ্যের বৃহৎ ব্যবসায়ী ও মজুতদাররা। এরা যত স্ফীত হয়েছে ততই চাষির কঙ্কালসার চেহারা সংখ্যায় বেড়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল এটা। বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের আজ একই চিত্র।

রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়— পুঁজিবাদ শ্রমিক-চাষির জীবনে শুধু সমস্যা তৈরিই করে, সেই সমস্যার সমাধান পুঁজিবাদের হাতে নেই। তার জন্য ইতিহাস নির্ধারিত পথ হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। আমাদের দেশের চাষি-মজুর সহ সমস্ত সাধারণ মানুষকে মুক্তি পেতে হলে সেই পথেই এগোতে হবে। মহান নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ শোষিত মানুষের কাছে সেই পথেরই সাথী হতে পুনরায় আহ্বান জানায়। এই মহান বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তিতে আগামী ১৭ নভেম্বর কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানের সর্বভারতীয় সমাবেশে দলে দলে যোগ দেবে দেশের মুক্তিকামী হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। তারই প্রস্তুতি চলছে গ্রাম শহরে।

কমরেড সলিল চক্রবর্তীর জীবনাবসান

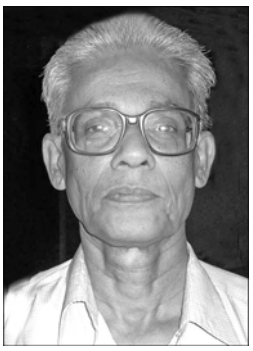

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড সলিল চক্রবর্তী দীর্ঘ ২৭ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর ১৩ অক্টোবর দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

১৯৫৭ সালে দক্ষিণ কলকাতার আশুতোষ কলেজে পড়ার সময় তিনি এ আই ডি এস ও-র সাথে যুক্ত হন। উল্লেখযোগ্য, ১৯৫৬ সালে আশুতোষ কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচনে ডিএসও বিপুল ভোটে জয়ী হয় এবং দীর্ঘ বছর নির্বাচিত হয়ে ছাত্র ইউনিয়ন পরিচালনা করে। সে সময় ছাত্র আন্দোলনের নেতা হিসাবে কমরেড প্রভাস ঘোষ (বর্তমানে পার্টির সাধারণ সম্পাদক) দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন কলেজে ছাত্রদের মধ্যে ডিএসও-র সদস্য হওয়ার যে আহ্বান নিয়ে গিয়েছিলেন, তাতেই আরও অনেক ছাত্রের সাথে কমরেড সলিল চক্রবর্তীও সাড়া দেন। আশুতোষ কলেজ তখন ছাত্র আন্দোলনের প্রবাহে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। কেরিয়ারের হাতছানি উপেক্ষা করে বহু ছাত্র এগিয়ে এসেছিলেন মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে। তাঁদের অন্যতম ছিলেন কমরেড সলিল চক্রবর্তী। তাঁর উদ্যোগে ও সম্পাদনায় ওই সময় আশুতোষ কলেজে ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত একটি দেওয়াল পত্রিকা 'ছাত্র সংহতি' প্রকাশিত হয়। ডিএসও-র মূল সংগঠনের সাথেও ধীরে ধীরে কমরেড সলিল চক্রবর্তী ঘনিষ্ঠ হন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য হন, পরে সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি কিছুদিন ডি এস ও-র অফিস সম্পাদকও ছিলেন। ডিএসও-র বাংলা মুখপত্র ছাত্র সংহতির প্রকাশনার ক্ষেত্রেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৬২ সালে আশুতোষ কলেজে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্রদের নানা দাবিতে ডি এস ও-র নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত হয়। কর্তৃপক্ষ প্রতিহিংসামূলক ভূমিকা নিয়ে ৭ জন ডি এস ও সংগঠককে কলেজ থেকে বহিষ্কার করে, যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কমরেড সলিল চক্রবর্তী।

কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় উজ্জীবিত হয়ে কমরেড সলিল চক্রবর্তী সর্বক্ষণের বিপ্লবী কর্মী হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। সচ্ছল পরিবারের পিছুটান ত্যাগ করে পার্টি-সেন্টারে থাকা শুরু করেন।

দীর্ঘ পার্টিজীবনে তিনি নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। ১৯৫৮ সালে ফি-বৃদ্ধি মকুবের দাবিতে রাজ্য জুড়ে দীর্ঘস্থায়ী ছাত্র আন্দোলনে, ১৯৫৯ সালে ও ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনে তিনি দায়িত্বশীল কর্মী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারে প্রয়াত নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী শ্রমমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর একান্ত সহায়কের (সি এ) ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব দেওয়া হয় কমরেড সলিল চক্রবর্তীকে। ১৯৬৭ ও '৬৯ সালে দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেই তিনি ওই দায়িত্ব আন্তরিকভাবে পালন করেন। পার্টিকর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ও জনগণের আর্থিক সহায়তায় পার্টির প্রথম নিজস্ব প্রিন্টিং প্রেস গণদাবী প্রিন্টার্স চালু করা হয় ১৯৭১ সালে। কেন্দ্রীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে 'গণদাবী প্রেস'-এর কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পিত হয় কমরেড সলিল চক্রবর্তীর উপর। ওই সময় থেকে ২০০৯ সালে অন্য সাংগঠনিক দায়িত্ব পাওয়ার আগে পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৮ বছর তিনি প্রেসের কাজ দক্ষতার সাথে দেখাশুনা করেছেন।

কমরেড সলিল চক্রবর্তী স্বভাবগত ভাবে অত্যন্ত আবেগময় ও কোমল হৃদয়সম্পন্ন ছিলেন। অভাবী গরিব কর্মী-সমর্থকদের সাহায্য করার জন্য তাঁর দরদি মন ব্যাকুল থাকত। পার্টির জুনিয়র ছেলেমেয়েদের তিনি খুবই স্নেহ করতেন, তাঁদের কথা আবদার রক্ষা করতেন। দুঃখের কথা শুনলে বা বলতে গেলে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত। এমনিতে তিনি মৃদুভাষী ছিলেন। পার্টির বাইরে নানা পেশার মানুষের সাথে মেলামেশায় তিনি সহজ স্বাভাবিক ছিলেন। তাঁর রুচিশীল মধুর ব্যবহার ও দরদি মন অনায়াসেই অপরিচিতকেও আপন করে নিতে পারত।

কমরেড সলিল চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ফুসফুসের সংক্রমণে ভুগছিলেন, সম্প্রতি কিডনির অসুস্থতায় আক্রান্ত হন। চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে ১৬ সেপ্টেম্বর হার্ট ক্লিনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ফুসফুসের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখতে হয়। অবস্থার সামান্য উন্নতি হওয়ায় তাঁকে ভেন্টিলেশন মুক্ত করা হয়। কিন্তু অচিরেই শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় আবার তাঁকে ভেন্টিলেশনে দিতে হয়। চিকিৎসকরা তাঁর ডায়ালিসিস করার পরামর্শ দেন। কিন্তু রক্তচাপজনিত সমস্যার কারণে একবার ছাড়া ডায়ালিসিস করাও সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় কিছুদিন চলার পর ১৩ অক্টোবর তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরই রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ও অন্যান্য রাজ্য নেতারা হাসপাতালে যান। রাজ্য অফিস ও রাজ্যের সমস্ত অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়। তাঁর মরদেহ পিস হেভেনে সংরক্ষিত রাখা হয়। নেতা কর্মী-সমর্থকদের দেখার ও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রক্তপতাকায় সজ্জিত তাঁর মরদেহ পরদিন সকাল ১০টা থেকে দলের কেন্দ্রীয় অফিসে রাখা হয়। তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর সাহা ও কমরেড ছায়া মুখার্জী। পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী এবং কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়। পলিটব্যুরোর পূর্বতন সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। মাল্যদান করেন রাজ্য কমিটির সদস্যরা এবং নানা জেলা ও আঞ্চলিক কমিটির প্রতিনিধিরা। তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা এবং যে সমস্ত সামাজিক সংগঠনের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন তাদের প্রতিনিধিরাও মাল্যদান করেন। এরপর উপস্থিত নেতা-কর্মী-সমর্থকরা অর্ধনমিত রক্তপতাকা হাতে নিয়ে শববাহী গাড়িকে সামনে রেখে কেওড়াতলা শ্মশান অভিমুখে শোকমিছিলে সামিল হন। গণদাবী প্রেসের সামনে প্রেসের কর্মীরা এবং এলাকার অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীরা মাল্যদান করেন। ২৫ অক্টোবর তাঁর স্মরণসভা।

কমরেড সলিল চক্রবর্তী লাল সেলাম

প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে ও প্রত্যেকে তার কাজ অনুযায়ী মজুরি পাবে — এই হল সমাজতন্ত্রের মার্কসবাদী সূত্র

লুডভিগের সাথে সাক্ষাৎকারে স্ট্যালিন

লুডভিগ ঃ যা কিছু মার্কিনী তাকেই এ দেশে খুব মর্যাদার চোখে দেখা হয় —এটা আমি দেখেছি। এমনকী যা কিছু ডলারের দেশের— তার প্রতি কেমন একটা পুজোর ভাব আছে। এই মানসিকতা আপনাদের শ্রমিক শ্রেণির মধ্যেও আছে এবং তা শুধু অটোমোবাইল বা ট্রাক্টরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সাধারণভাবে আমেরিকান সব কিছুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

স্ট্যালিন ঃ আপনি একটু বাড়িয়ে বলছেন। আমেরিকান সব কিছুর প্রতি আমাদের খুব একটা উচ্চ শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু শিল্পে, প্রযুক্তিতে, সাহিত্যে এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে মার্কিনীরা যে দক্ষতা দেখিয়ে থাকে, আমরা সেই দক্ষতাকে সম্মান করি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা পুঁজিবাদী দেশ, এ কথা কখনওই আমরা ভুলে যাই না। কিন্তু আমেরিকানদের মধ্যে এমন বহু মানুষ আছেন, যাঁরা শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে স্বাস্থ্যবান, কাজের প্রতি, ন্যস্ত দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে যাঁরা খাঁটি। সেই দক্ষতা, সেই সারল্য আমাদের হৃদয়ের সংবেদনশীল তন্ত্রীকে স্পর্শ করে। আমেরিকা একটা অত্যন্ত বিকশিত পুঁজিবাদী দেশ হওয়া সত্ত্বেও তার উৎপাদনের ক্ষেত্রে, উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান ব্যবহারিক আচরণের ক্ষেত্রে এক ধরনের গণতান্ত্রিক উপাদান আছে। পুরনো ইউরোপীয় দেশগুলি সম্পর্কে সে কথা বলা যায় না। সেখানে সামন্তবাদী আভিজাত্যের উদ্ধত ভাবটি আজও বর্তমান।

সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে সামন্তবাদ বহু পূর্বে ইউরোপে ধ্বংস হয়েছে। তবুও জীবনে ও প্রথায় এর অনেক ধ্বংসাবশেষ এখনও টিকে আছে। এখনও এমন অনেক প্রযুক্তিবিদ, বিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক ও লেখক আছেন, যাঁরা শিল্পে, প্রযুক্তিতে, বিজ্ঞানে ও সাহিত্যে সামন্তবাদী পরিবেশ থেকে উদ্ভূত আভিজাত্যের অভ্যাস বহন করে আসছেন। সামন্তবাদী ঐতিহ্য আজও সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়নি। আমেরিকা সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না। আমেরিকা হল জমিদারহীন, আভিজাত্যহীন এক 'মুক্ত উপনিবেশবাদীদের' দেশ। সেইজন্য আমেরিকার উৎপাদনে ও জীবনে দৃঢ় ও সরলতম অভ্যাসগুলির দেখা পাওয়া যায়। আমেরিকা সফরে গিয়েছেন, শ্রমিক শ্রেণি থেকে আসা আমাদের দেশের এরকম শিল্প-কর্মকর্তারা এই বিষয়টি লক্ষ করেছেন। তাঁরা অবাক বিস্ময়ের সাথে বলেছেন, আমেরিকায় কোনও উৎপাদনের কাজে বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে একজন শ্রমিকের সাথে একজন ইঞ্জিনিয়ারের পার্থক্য করা কঠিন। তাঁরা এতে খুবই খুশি হয়েছেন। কিন্তু ইউরোপের ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা।

কিন্তু আপনি যদি কোনও বিশেষ একটা জাতির প্রতি অথবা তার নাগরিকদের অধিকাংশের প্রতি আমাদের পছন্দের কথা জানতে চান তবে অবশ্যই আমরা জার্মান জাতির প্রতি আমাদের পছন্দের কথা বলব। তার সাথে আমাদের মার্কিন পছন্দের তুলনাই চলে না।

লুডভিগ ঃ ঠিক নির্দিষ্ট করে জার্মান জাতি কেন?

স্ট্যালিন ঃ তাঁরা দুনিয়াকে মার্কস-এঙ্গেলসের মতো মহান মানুষ দিয়েছেন— হয়তো এই কারণে। বিষয়টা এভাবে বলাই ভাল।

লুডভিগ ঃ নিজেদের সঠিকতা সম্পর্কে আপনাদের কখনও সন্দেহ হয় না?

স্ট্যালিন ঃ সন্দেহ একেবারে কখনওই হয় না, এ কথা বলি কী করে?

লুডভিগ ঃ সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, কিছু জার্মান রাজনীতিবিদ ভয় পাচ্ছেন, সোভিয়েত ও জার্মানির মধ্যে পুরনো বন্ধুত্বের নীতি পরিত্যক্ত হবে। এই ভয়ের জন্ম হয়েছে সোভিয়েত ও পোল্যান্ডের মধ্যে সন্ধি আলোচনার প্রেক্ষিতে। এইসব আলোচনার ফলে যদি পোল্যান্ডের বর্তমান সীমানাকে সোভিয়েত স্বীকৃতি দেয়, তা হলে তা জার্মান জনগণের মধ্যে তিক্ত হতাশার জন্ম দেবে— যারা এতদিন বিশ্বাস করেছে যে সোভিয়েত ভার্সাই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়ছে এবং তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার কোনও ইচ্ছাই তার নেই।

স্ট্যালিন ঃ আমি জানি, কিছু জার্মান রাজনীতিবিদের মধ্যে এই ধরনের অসন্তোষ ও আতঙ্ক দেখা দিতে পারে যে, পোল্যান্ডের সাথে আপস আলোচনার ক্ষেত্রে বা কোনও সন্ধি চুক্তিতে সোভিয়েত এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, যার ফলে পোল্যান্ডের দখলদারি ও সীমানার প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুমোদন বোঝাবে।

আমার মতে এই আতঙ্ক ভ্রান্ত। যে কোনও রাষ্ট্রের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের আগ্রহের কথা আমরা সবসময় ঘোষণা করেছি। আমরা ইতিমধ্যেই অনেক দেশের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছি। পোল্যান্ডের সাথে এরকম চুক্তি সম্পাদনে আমাদের ইচ্ছার কথা আমরা প্রকাশ্যে বলেছি। আমরা যখন ঘোষণা করি, পোল্যান্ডের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনে আমরা প্রস্তুত, তখন তা কৃত্রিম বাগাড়ম্বর নয়। তার অর্থ হল আমরা সত্যসত্যই এরকম চুক্তি স্বাক্ষর করতে চাই। বলতে পারেন, আমরা এক বিশেষ ধরনের রাজনীতিবিদ। এমন রাজনীতিবিদ আছেন, যাঁরা আজ একটি বিবৃতি বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে কালই তা পুরোপুরি ভুলে যান, যা যা বলেছিলেন তা অস্বীকার করেন। এতে তাঁরা কোনও লজ্জাবোধ

করেন না। আমরা ওভাবে চলতে অভ্যস্ত নই। আমরা বিদেশে যা করি, দেশের মানুষ, সমস্ত শ্রমিক-কৃষক তা জানেন। আমরা যদি বলি এক, আর করি আর এক, তা হলে জনগণের কাছে আমরা মর্যাদা হারাব। পোলরা যে মুহূর্তে ঘোষণা করল যে তারা আমাদের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে চায়, আমরা স্বভাবতই রাজি হলাম এবং আলোচনা শুরু শুরু করলাম।

জার্মানদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে সবচেয়ে বিপজ্জনক জিনিস কী ঘটতে পারে? তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কের অবনতিমূলক পরিবর্তন? কিন্তু তার কোনও ভিত্তি নেই। একেবারে ঠিক পোলদের মতো আমরাও অবশ্যই ঘোষণা করব, পোল্যান্ড বা সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানা পরিবর্তন বা তাদের স্বাতন্ত্র্য হরণের জন্য আমরা বলপ্রয়োগ বা আক্রমণের আশ্রয় নেব না। আমরা যেমন পোলদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তারাও তেমনি একই অঙ্গীকার করেছেন। এইরকম একটা অনুচ্ছেদ, যেমন, নিজ নিজ রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বা সীমান্ত সংহতি লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে আমরা যুদ্ধ করতে চাই না — এ ছাড়া কোনও চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না। এ ছাড়া কোনও চুক্তির প্রশ্নই ওঠে না। খুব বেশি হলে এই আমরা করতে পারি।

এটা কি ভার্সাই ব্যবস্থার স্বীকৃতি? অথবা এটা কি বর্তমান সীমান্তের গ্যারান্টি দেওয়া? না। আমরা কখনওই পোল্যান্ডের সীমান্তের গ্যারান্টিদাতা হইনি। কখনও হবও না। ঠিক যেমন পোল্যান্ড আমাদের সীমান্তের গ্যারান্টিদাতা হয়নি এবং তা হবেও না। এখনকার মতোই জার্মানির সাথে আমাদের মিত্রতার সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে। এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সুতরাং যে ভয়েরকথা আপনি বললেন, তার কোনও ভিত্তি নেই। এ সবের জন্ম হয়েছে কয়েকজন পোল আর ফরাসির রটানো গুজবের ভিত্তিতে। পোল্যান্ড যদি সই করে তবে আমরা যখন চুক্তিটি প্রকাশ করব, তখন এসব দূর হয়ে যাবে। তখন প্রত্যেকেই দেখবেন, এই চুক্তিতে জার্মানির বিরুদ্ধে কিছু নেই।

লুডভিগ ঃ এই বক্তব্যে আমি খুবই আনন্দিত। এবার এই প্রশ্নটি রাখতে আমায় অনুমতিদিন। সাধারণ সাম্যের প্রেক্ষিতে বিদ্রূপাত্মক ঢংয়ে আপনি প্রায়ই মজুরি সমানীকরণের কথা বলেন। কিন্তু সাধারণ মজুরি সমানীকরণ একটা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ। নয় কি?

স্ট্যালিন ঃ সকলে সমান মজুরি পাবে, একই পরিমাণ মাংস ও রুটি পাবে, একই পরিমাণে কাপড় পরবে, একই পণ্য একই পরিমাণে পাবে— এরকম সমাজতন্ত্র মার্কসবাদের অজানা।

মার্কসবাদ বলে, যতদিন না শ্রেণিগুলি পুরোপুরি অবলুপ্ত হচ্ছে, যতদিন না জীবিকার উপায় থেকে শ্রমকে মানুষের মুখ্য চাহিদায় সামাজিক ঐচ্ছিক শ্রমে পরিণত করা যাচ্ছে, ততদিন মানুষ যে ধরনের যতটা কাজ করবে ততটাই মজুরি পাবে। 'প্রত্যেকের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ও প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী'—এই হল সমাজতন্ত্রের মার্কসবাদী সূত্র। অর্থাৎ সাম্যবাদের প্রথম স্তরের, সাম্যবাদী সমাজের প্রথম স্তরের সূত্র।

একমাত্র সাম্যবাদের উচ্চতর পর্যায়ে, একমাত্র উচ্চতর স্তরেই স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে কর্মরত প্রত্যেককে তাঁদের কাজের বিনিময়ে তাদের স্ব স্ব প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়া হবে— 'প্রত্যেকের থেকে তার নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেকে তার স্ব স্ব প্রয়োজন অনুযায়ী'।

এটা খুব পরিষ্কার, জনগণের প্রয়োজনের পার্থক্য আছে এবং সমাজতন্ত্রেও এই পার্থক্য থাকবে। জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্য যে আছে, এ কথা সমাজতন্ত্র কখনও অস্বীকার করেনি। সবাইকে সমান করার দিকে স্টারনারের ঝোঁকের জন্য মার্কস কীভাবে তাঁর সমালোচনা করেছিলেন, সেটা দেখুন। ১৮৭৫ সালে গোথা কর্মসূচির উপর মার্কসের আলোচনা এবং মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের পরবর্তী লেখাগুলো অধ্যয়ন করলে আপনি দেখতে পাবেন কী তীক্ষ্ণভাবে তাঁরা এই ধারণার উপর আঘাত হেনেছেন। এই ধারণার উৎস হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক কৃষকসুলভ মানসিকতা, ভাগ করার ও সমান ভাগের মনোবৃত্তি। আদিম কৃষি সাম্যবাদের মনোভাব। এর সাথে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের কোনও সম্পর্ক নেই। যারা মার্কসবাদের সাথে অপরিচিত, একমাত্র তারাই এই আদিম ধারণা পোষণ করতে পারে যে, রুশ বলশেভিকরা সমস্ত সম্পদকে এক সাধারণ তহবিলে জড়ো করতে চায় ও তারপর তা সমান ভাগে ভাগ করতে চায়। এই ধারণা, মার্কসবাদের সাথে সম্পর্কহীন মানুষের ধারণা। ক্রমওয়েল এবং ফরাসি বিপ্লবের সময়কার 'আদিম কমিউনিস্টরা' এইভাবেই সাম্যবাদকে ভুল বুঝেছিলেন। কিন্তু এই সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদীদের সাথে মার্কসবাদ ও রুশ বলশেভিকদের কোনও সম্পর্ক নেই।

লুডভিগ ঃ আপনি সিগারেট খাচ্ছেন। কিংবদন্তীতুল্য আপনার সেই পাইপটা কোথায়, মিঃ স্ট্যালিন? এক সময় আপনি বলেছিলেন, কথা আর কিংবদন্তী মুছে যায়, কিন্তু কাজ রয়ে যায়। বিশ্বাস করুন, বিদেশে এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যারা আপনার কথা ও কাজের কিছু জানে না, কিন্তু আপনার পাইপের কথা তারা জানে।

স্ট্যালিন ঃ পাইপটা বাড়িতে ফেলে এসেছি।

লুডভিগ ঃ এবার একটা প্রশ্ন করব যা আপনাকে খুবই অবাক করতে পারে।

স্ট্যালিন ঃ আমরা, রুশ বলশেভিকরা, অনেকদিন হল কোনও কিছুতেই অবাক হই না।

লুডভিগ ঃ হ্যাঁ, জার্মানিতেও আমরা তাই।

স্ট্যালিন ঃ হ্যাঁ, খুব শীঘ্রই জার্মানিতে আপনারাও আর অবাক হবেন না।

লুগভিগ ঃ আমার প্রশ্ন এই রকম। আপনি অনেক সময় ঝুঁকি আর বিপদের পথ নিয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন। অনেক লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন। আপনার অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আর

সাতের পাতায় দেখুন

‘সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় লোকে চাকরি খোঁজে না, চাকরিই খোঁজে লোক’

আমেরিকার কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, ইংরেজির বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং মার্কিন লেখকদের ফ্যাসিস্ট বিরোধী লিগের কার্যকরী সম্পাদক ফ্রাঙ্কলিন ফলসম ‘আমার চোখে সোভিয়েত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার’ শীর্ষক একটি বই লিখেছেন। এই বইয়ে সোভিয়েত নাগরিকদের শ্রমের অধিকার, অন্ন-বস্ত্রের অধিকার, স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, নারীর সমানাধিকার, জাতিসমূহের সমানাধিকার, শিল্প-কলা উপভোগের অধিকার, ধর্মাচরণের অধিকার, সমালোচনা-ব্যবস্থাপনা ও শরিকানার অধিকার, শান্তির অধিকার প্রভৃতি নিয়ে মূল্যবান আলোচনা রয়েছে। বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন মার্কসবাদকে হাতিয়ার করে মহান লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালের মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এইসব অধিকার রুশ নাগরিকদের দিয়েছিল।

ফ্রাঙ্কলিন লিখেছেন, ১৯৩০ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে বেকারি নেই। ১৯৩৬ সালে সোভিয়েত সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে চাকরির নিশ্চয়তা দিয়েছিল। শ্রমের অধিকার সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের সংবিধানসম্মত অধিকার। অর্থাৎ তাদের কাজ পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে এবং তার পরিমাণ ও গুণানুযায়ী বেতন রাষ্ট্র-নির্ধারিত ন্যূনতম পারিশ্রমিকের কম নয়। সমাজের চাহিদাকে হিসাবে ধরে নাগরিকদের প্রবণতা, দক্ষতা, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা অনুযায়ী কাজ বা বৃত্তি বেছে নেওয়ার অধিকার আছে।

এই অধিকার সুনিশ্চিত করা হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজের উৎপাদনী শক্তিগুলির ক্রমাগত বৃদ্ধি, বিনা ব্যয়ে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ, দক্ষতার উন্নতি এবং নতুন নতুন বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের দ্বারা।

বিপ্লবের আগে, জারের রাশিয়ায় বেকারি ছিল। তারপর সাত বছর ধরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ চোদ্দটি বিদেশি রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর হামলায় শিল্প মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহু কৃষক কাজের খোঁজে শহরে এসে ভিড় জমায়। কৃষক জনগণের সঙ্গী ছিল মরশুমি বেকারির ঝামেলা। বিশের দশকের শেষে গ্রামাঞ্চলে বেকারের সংখ্যা ছিল ৮০ থেকে ৯০ লক্ষ। ব্যাপক নিরক্ষরতা ও শিল্পের কাজে অদক্ষতার দরুন এদের শিল্পে গ্রহণ করা সহজ ছিল না।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এদের দক্ষ করে তোলার ব্যবস্থা করেছিল। প্রথমত, বহু সংখ্যক বেকারকে নিখরচায় খাওয়ার এবং হোস্টেল বা ব্যারাকে থাকার সুবিধা দিয়েছিল। এছাড়াও ছিল নগদ অর্থ সাহায্য। অনেক ক্ষেত্রে বেকার জনতা নিজেরাই সমবায় গঠনের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কাজে শরিক হওয়ার জন্য সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হত। এই ধরনের কয়েকটি জনকল্যাণ প্রকল্প গড়ে উঠলে ওইসব সমবায়ে নতুন ধরনের কাজ করার জন্য কর্মী প্রশিক্ষণমূলক পরিকল্পনা চালু করা হয়।

মূলত, শিল্পায়নই বেকারির অবসান ঘটিয়েছিল। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার প্রথম বছরই অর্থাৎ ১৯২৯ সালে অর্থনীতির কোনও কোনও শাখায় সত্যিকার শ্রমিক ঘাটতি শুরু হয়েছিল। যেমন— কয়লাখনি ও কাঠশিল্প, পিট সংগ্রহ ও মাল ওঠানো-নামানোর কাজে। ১৯৩০ সালের শেষ নাগাদ প্রত্যেকের জন্য এসেছিল একাধিক কাজের সুযোগ। ১৯২৯-১৯৪১ সালের মধ্যে চালু হয়েছিল ৯০০০ নতুন বৃহদায়তন শিল্পোদ্যোগ।

অতীতের উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়া বেকারির সমস্যাটি সোভিয়েত সমাজতন্ত্র নানাভাবে সমাধান করেছিল। বৃহদায়তন শিল্প ও কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা—এ দুটিরই বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়েছিল যাবতীয় মূল উৎপাদন ব্যয়ের সামাজিক মালিকানার কল্যাণে। ১৯৩০ সাল থেকে বেকারি সৃষ্টি হওয়ার কোনও কারণই সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতিতে দেখা যায়নি।

শ্রমকে সহজতর করা, শ্রমসময়কে কমানোই ছিল সোভিয়েত সমাজের লক্ষ, শ্রমকে এড়ানো মোটেই লক্ষ্য ছিল না। বরং শ্রম ছিল সম্মানিত আর উত্তম শ্রমিকরা শুধু আর্থিক পুরস্কারই নয়, উচ্চ সম্মানেরও অধিকারী হত।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে শ্রমের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিশ্রাম ভোগ করার অধিকার। সোভিয়েত সংবিধানের ৪১নং ধারা অনুযায়ী, সোভিয়েত নাগরিকদের বিশ্রাম ছিল অধিকার। এই অধিকার সুনিশ্চিত করা হয় শ্রমশিল্প, অফিস ও বিভিন্ন পেশার কর্মীদের জন্য সর্বাধিক ৪১ ঘণ্টা কাজের সপ্তাহ, একাধিক বৃত্তি ও পেশার জন্য কম কাজের ঘণ্টা প্রবর্তন করে। বার্ষিক সবেতন ছুটি ও সাপ্তাহিক বিশ্রামের দিনের সংস্থান করে, একইভাবে সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও স্বাস্থ্য চর্চার প্রতিষ্ঠানগুলির আরও সম্প্রসারণ করে এবং ব্যাপক আকারে খেলাধুলা, শরীর চর্চা ও পর্যটনের বিকাশ ঘটিয়ে, আবাসিক নীতির ভিত্তিতে বিশ্রামের অনুকূল সুযোগ ও অবসর সময়ের যথোপযুক্ত ব্যবহারের অন্যান্য ব্যবস্থার সংস্থান করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমের অধিকারের মতো শ্রমের বাধ্যতাও ছিল। অবসরপ্রাপ্ত, বিকলাঙ্গ ও শিশু ছাড়া সোভিয়েত দেশে মানুষের এমন কোনও স্তর নেই যারা শ্রম ছাড়া থাকতে পারে। এ দেশে খাজনার মুনাফাভোগী কোনও জমিদার নেই। নেই বিনিয়োগকারী কোনও মুনাফাজীবী। কোনও সময় ব্যক্তি বিশেষ কালোবাজারি, তছরুপ বা কারখানার মালপত্র চুরির মাধ্যমে পরের শ্রমে জীবিকার্জনের চেষ্টা করলে তাকে অবশ্যই কঠোর সাজা পেতে হয়। পরজীবীরা নয়, কর্মীষ্ঠরাই সমাজতন্ত্রে আদৃত।

সুস্থ, পূর্ণবয়স্ক মানুষের পক্ষে শ্রমের জন্য অপরাধবোধ থাকার কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না। কারণ প্রতিটি মানুষই তো দেশের জমি, কল-কারখানা ও প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানার শরিক।

বড় বড় সংস্থা ও কলকারখানা ইত্যাদির ফটকে রাখা বিশেষ বোর্ডে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। শহরগুলিতে (বড় শহরের মহল্লাতেও) বিশেষ ব্যুরো রয়েছে যেগুলি কল-কারখানার কর্মী পরিস্থিতির খোঁজ রাখে এবং জনসাধারণকে আরও সুবিধাজনক চাকরির সন্ধানে সহায়তা জোগায়।

সোভিয়েত রাশিয়ার সংবাদপত্রে কলামের পর কলাম বোঝাই ছিল কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি ও এজন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার বিবরণীতে। কিন্তু সেখানে ‘কর্ম চাই’ জাতীয় একটিও বিজ্ঞাপন ছিল না, যেমনটি দেখা যায় পুঁজিবাদী দেশগুলিতে।

এখানে ব্যাপারটাই উল্টো, চাকরিই খুঁজছে লোককে।

মনমোহন সিং থেকে মোদি— কর্মসংস্থান কমেই চলেছে

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর দেওয়া বহু প্রতিশ্রুতির অন্যতম ছিল —বিপুল কর্মসংস্থান। বলেছিলেন ক্ষমতায় এলে বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরির ব্যবস্থা করবেন। তিনি যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি তা বিরোধীদের কোনও অভিযোগ নয়, সংঘ পরিবারের লোকেরাও বলছে। বাস্তবে বছরে ২ কোটি চাকরি দেওয়া দূরে থাকুক হু হু করে কমছে কর্মসংস্থানের সুযোগ।

সাম্প্রতিক কয়েকটি কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে, দেশে কর্মসংস্থানের বর্তমান চিত্রটি ভীষণই হতাশাজনক। কংগ্রেস সরকারের আমল (২০১২) থেকে শুরু করে বিজেপির আমল (২০১৬) এই পাঁচ বছরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার তীব্রগতিতে কমেছে যা শ্রম মন্ত্রকের সমীক্ষা অনুযায়ী স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে আগে ঘটেনি। উৎপাদন শিল্প থেকে শুরু করে নির্মাণ শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি-বিপিও, বস্ত্রশিল্প, বিদ্যুৎ সহ পরিষেবা ক্ষেত্র — সবেতেই কর্মসংস্থান তলানিতে। বাস্তবে এই অধোগতি ত্বরান্বিত হয় ’৯১ এর বিশ্বায়ন-উদারীকরণ নীতি গ্রহণের পর থেকে। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেসনের (এন এস এস ও) সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৯-২০০০ ও ২০০৪-০৫ এ যেখানে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক ১ শতাংশ, ২০০৫-০৯ সালে সেটাই কমে ০.৭ শতাংশ (বার্ষিক) দাঁড়ায়। ২০০৯-১০ ও ২০১১-১২ সালে এই হার আরও কমে ০.৪ শতাংশ দাঁড়িয়ে যায়। বছরে প্রায় ৩৭.৪ লক্ষ কর্মক্ষম মানুষ কাজ হারাচ্ছেন। যদিও সামগ্রিকভাবে (সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্র সহ) সংখ্যাটা প্রায় ৫৩.১৬ লক্ষ প্রতি বছরে।

২০১৫-১৬ সালে দেশের লক্ষাধিক বাড়িতে সমীক্ষা চালায় শ্রমমন্ত্রকের লেবার ব্যুরো। আবার কুইক এমপ্লয়মেন্ট সার্ভে -এর পক্ষ থেকে ২০১৫ অবধি দেশের ২০০০ প্রতিষ্ঠানে এবং ২০১৬ থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা ক্ষেত্র সহ প্রায় দশ হাজারটি প্রতিষ্ঠানে (উৎপাদন থেকে শুরু করে দেশের সমস্ত অগ্রগণ্য তথ্যপ্রযুক্তি- বিপিও’র মত সংস্থায়) এই সমীক্ষা চলছে।

সারা দেশে ২০১০ -১২ সালে মাসিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি যেখানে প্রায় ৭৬ হাজার, ২০১৫ নাগাদ সেটাই কমে দাঁড়ায় মাত্র ৮ হাজারে। সমীক্ষা আরও বলছে কৃষি-খনি-পাথর খাদান সহ প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলিতে সর্বাধিক ৫২.৯ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন এই সময়ে। এর মধ্যে মহিলাদের বেকারত্বের হার বেড়েছে সবচেয়ে বেশি।

পুঁজিবাদী মুনাফানির্ভর অর্থনীতিতে যে কোনও উন্নয়নশীল দেশে ধরা হয় কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকরা বেকার হয়ে গেলে অকৃষিক্ষেত্রে (বিশেষত উৎপাদন শিল্প, নির্মাণ-বাণিজ্য-পরিবহন সহ অসংগঠিত ক্ষেত্রে) সেই অনুপাতে কর্মসংস্থান হওয়ার কথা। বাস্তবে কাজ হারানো শ্রমিক আজ আর কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই। শ্রমনিবিড় সমস্ত শিল্পে বাড়ছে কাজ হারানো শ্রমিকের হাহাকার। যে নির্মাণ শিল্পকে পুঁজিবাদী নিয়মে ধরা হয় কৃষি শ্রমিক-ক্ষুদ্র-মাঝারি চাষির শেষ আশ্রয়স্থল, সেখানেও ২০১৩-১৪ ও ২০১৫-১৬ তে মোট কর্মচ্যুতি হয়েছে প্রায় ৪.২ লক্ষ। যে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অনেক প্রত্যাশা তৈরি করা হয়েছিল সেখানেও কর্ম সংস্থানে ধস অব্যাহত। সেখানে ২০১০-১২ সালে মোট কর্মসংস্থান হয়েছিল ১২.৪৬ লক্ষ ২০১২-১৪ সালে সেটাই নেমে আসে মাত্র ১.৯৬ লক্ষ। উৎপাদন শিল্পে কর্মসংস্থান ২০১০-১২ সালে ৫.২৯ লক্ষ থেকে কমে ২০১৪-১৫ সালে দাঁড়ায় ৩.৩১ লক্ষ।

সামগ্রিকভাবে সারা দেশে কর্মসংস্থানে এই ভয়াবহ সংকটের মূলে রয়েছে পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি। কোনও সরকার পরিবর্তন বা কোনও টোটকা প্রয়োগ করেই কর্মসংস্থানের অধোগতিকে আর রোখা যাবে না।

কংগ্রেস সরকারের আমলে চালু হওয়া বিশ্বায়ন-উদারীকরণ বেসরকারীকরণের নীতি অথবা সেই একই পথে চলা বর্তমান বিজেপি সরকারের নোট বাতিল, জি এস টি চালু কোনও ভাবেই বাজার অর্থনীতির সংকটকে রুখতে পারে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকট ঘনীভূত হচ্ছে প্রতিদিন।

রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির বিশাল মিছিল

২১ সেপ্টেম্বর তালাকপ্রাপ্তা, স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা, নির্যাতিতা অসহায় নারীরা রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির ডাকে মুর্শিদাবাদ জেলা এডিএমের কাছে দাবিপত্র পেশ করেন। সহস্রাধিক মহিলার সুসজ্জিত একটি মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জেলাশাসক দপ্তরের সামনে জমায়েত হয়। তালাক সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়কে স্বাগত জানিয়ে মিছিলে দাবি ওঠে, মুসলিম মহিলাদের সম্পত্তির সম অধিকার দিতে হবে, হালালা-নিকাহ বেআইনি ঘোষণা করতে হবে। নির্যাতিত, অসহায়, উচ্ছেদ হওয়া মেয়েদের স্বনির্ভর করার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। বক্তব্য রাখেন সমিতির সভাপতি অধ্যাপিকা সুজাতা দে বসু, সম্পাদিকা খাদিজা বানু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নভেম্বর বিপ্লব শতবর্ষে নারায়ণগড়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট

মহান নভেম্বর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে যুব সংগঠন ডিওয়াইও এবং ছাত্র সংগঠন ডিএসও-র উদ্যোগে পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের সাইকাতে ১৪ অক্টোবর থেকে তিনদিনের ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের কিংবদন্তী ফুটবলার গোষ্ঠ পালের স্মৃতিতে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে ষোলটি টিম অংশ নেয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট খেলোয়াড় তপন কুমার সাউ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ভবতোষ মাইতি এবং সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। যুবকদের মধ্যে সুস্থ মনন ও সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই আয়োজন বলে জানায় উদ্যোক্তা সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ।

ভয়াবহ ডেঙ্গি আক্রমণ, প্রশাসন নিষ্ক্রিয়

একের পাতার পর

এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রোগ মোকাবিলায় প্রশাসন ও চিকিৎসা বিভাগকে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলার বদলে মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ত এই জ্বর ডেঙ্গি নয়, তা প্রমাণ করতে। ১২ অক্টোবর নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, পরিস্থিতি মোটেই উদ্বেগজনক নয় এবং জ্বরে মৃতদের যে ডেঙ্গি -ই হয়েছে, নিশ্চিত ভাবে তা বলা যায় না। তিনি দায়ী করেছেন ল্যাবরেটরিগুলিকে, যেন তারা মিথ্যা রিপোর্ট দিচ্ছে। যদিও তাঁর কথা থেকেই বেরিয়ে এসেছে, এ রাজ্যে কতজন মানুষ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত, সে হিসেবটুকুও সরকারের কাছে নেই। মনে পড়ে যায়, চা-বাগান, আমলাশোলে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাকে পূর্বতন সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের গায়ের জোরে 'রোগে ভুগে মৃত্যু' বলে প্রমাণ করার অপচেষ্টার কথা।

আগে থেকেই ডেঙ্গি নিয়ে প্রশাসনের কিছুটা রাখঢাক ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর সরকারি কর্তারা কার্যত ডেঙ্গির বিপদকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়ার পথ ধরেছেন। পৌর প্রশাসনগুলির তরফেও মশা মারার কর্মসূচিতে গা ঢিলা মনোভাব বেড়েছে।

প্রতি বছরই বর্ষার শুরু থেকে শীত পড়ার আগে পর্যন্ত সময়টায় মারণ রোগ ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, এনকেফেলাইটিস কলকাতা সহ এ রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। প্রতি বছরই রোগের প্রকোপ বাড়ছে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে ২০১৫ সালে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৮,৫১৬ জন, মারা গিয়েছিল ১৪ জন। ২০১৬-তে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২২,৮৫৬ জন এবং মৃতের সংখ্যা ৪৫ জন। এই অবস্থায় সরকারের কর্তব্য ছিল এ বছর বর্ষা আসার আগে থেকেই সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করা। তা তারা করেনি। ফলে রোগের প্রকোপ প্রায় মহামারীর আকার ধারণ করেছে।

এমনিতেই সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত ডাক্তার নার্সের অভাব, নেই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো। এই অবস্থায় রাজ্য জুড়ে জ্বরের প্রকোপ সামাল দিতে যে ব্যবস্থাগুলি তৎপরতার সঙ্গে নেওয়া দরকার ছিল, সেগুলির কোনওটিই সরকার নেয়নি। বিশেষজ্ঞরা বার বার বলছেন, আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে ডেঙ্গি ভাইরাসের চরিত্র পাল্টে যাচ্ছে। ফলে বদলে যাচ্ছে রোগের লক্ষণ। প্রয়োজন ডেঙ্গির নতুন বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিনে নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে সেগুলি মোকাবিলার ব্যবস্থা করা। তা করার কথা ভাবেনি সরকারি স্বাস্থ্যদপ্তর। রক্তপরীক্ষা করে ভাইরাসের চরিত্র বোঝার আগেই রোগী মরণাপন্ন হয়ে পড়ছে। অনেক সময় চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয়েছে মনে করে রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়ার পর নতুন করে আবার তারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে অনেকের। প্রয়োজন মতো প্লেটলেট মিলছে না ব্লাড ব্যাঙ্কে। এমনকী প্লেটলেট নিয়ে কালোবাজারিও চলছে। এই অবস্থায় দূরের রক্তদান শিবিরগুলি থেকে রক্ত সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক এই অজুহাতে কলকাতার সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক ৯ অক্টোবর থেকে টানা ছ'দিন রক্ত সংগ্রহ বন্ধ রেখেছে। ডেঙ্গি আক্রান্ত এক দিনের শিশুকেও অতি দরকারি প্লেটলেট দেওয়া যায়নি বলে সংবাদে প্রকাশ। সরকারি দপ্তরের অপদার্থতা ও মানুষের প্রতি অবহেলা কতখানি হলে এমন ঘটনা ঘটতে পারে!

গুজরাট, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্রে সোয়াইন ফ্লু ও ডেঙ্গিতে মৃত মানুষের সংখ্যার হিসাব দিয়ে সাংবাদিকদের সামনে মুখ্যমন্ত্রী প্রাণপণে প্রমাণ করতে চেয়েছেন এ রাজ্যের অবস্থা ততখানি খারাপ নয়। কথার প্রলেপ দিয়ে রোগের ভয়াবহতা ঢাকার চেষ্টা না করে এই মুহূর্তে সরকারি প্রশাসন ও চিকিৎসা বিভাগকে কাজে লাগিয়ে রোগ মোকাবিলার জরুরি ব্যবস্থা না নিলে ডেঙ্গি পরিস্থিতি অচিরেই আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে।

ডেঙ্গি মোকাবিলার দাবিতে বিক্ষোভ

অবিলম্বে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং বদরতলা জেলা হাসপাতালে ডেঙ্গু পরীক্ষা চালু করা, ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান, ডেঙ্গু মশা মারার জন্য প্রতিনিয়ত প্রতিষেধক স্প্রে করা, গরিব মানুষ যাদের মশারি নেই তাদের অবিলম্বে মশারি সরবরাহ, আক্রান্ত এলাকায় চিকিৎসা শিবির করা এবং ড্রেন ও জলাশয় পরিষ্কার করা প্রভৃতি দাবিতে ১০ অক্টোবর উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন এসইউসিআই (সি) আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড অজয় বাইন।

ব্যারাকপুরে মহকুমা শাসকের দপ্তরে ১২ অক্টোবর ডেপুটেশন দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে দাবি জানানো হয়— ব্যারাকপুর মহকুমায় ডেঙ্গি কে মহামারী ঘোষণা করতে হবে, মহকুমার অন্তর্গত প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গির উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে অন্তত ডেঙ্গির সমস্ত রকম রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং কারখানার শ্রমিক লাইনগুলি ও তার সংলগ্ন ঘিঞ্জি গলিগুলিতে বিশেষ সাফাই অভিযান করতে হবে।

বেহালায় বিক্ষোভ

কলকাতা পুরসভার বেহালা অঞ্চলে ডেঙ্গির প্রকোপ থেকে মানুষকে বাঁচাবার দাবিতে ১৬ অক্টোবর পশ্চিম বেহালার পুরসভার অফিসে এসইউসিআই (সি)-র পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। আগের দিন ব্যাপক প্রচারের মধ্য দিয়ে এই বিক্ষোভে জনগণকে সামিল হতে আবেদন জানানো হয়।

এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে ওড়িশায় বিক্ষোভ

বকেয়া জলকর আদায় বন্ধ করা, এনক্রোচমেন্ট ফি আদায় বন্ধ করে জমির পাট্টা প্রদান প্রভৃতি দাবিতে ৯ অক্টোবর ওড়িশার পাটনা তহসিল অফিস ঘেরাও করা হয়। সহস্রাধিক মানুষের এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড রঘুনাথ দাস। তিনি কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্যের বিজেডি সরকারের 'চাষি মারা নীতির' তীব্র সমালোচনা করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক বেণুধর সর্দার এবং এস ইউ সি আই (সি) পাটনা আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড প্রকাশ মল্লিক। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সভাপতি কমরেড ঘনশ্যাম মহন্ত।

ভোপালে মহিলাদের বিশাল সমাবেশ

৩ অক্টোবর মধ্যপ্রদেশের ভোপালে অল অডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ডাকে বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মদের প্রসার রোধ, পর্নোগ্রাফি বন্ধ করা, নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা প্রভৃতি দাবিতে ৫০ হাজার মানুষের স্বাক্ষরিত দাবিপত্র এ ডি এমের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রচনা আগরওয়াল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য জ্ঞাপন করেন এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সভানেত্রী কমরেড জলি সরকার।

দুঃস্থ শিশুদের বস্ত্র বিতরণে ছাত্ররা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আমতলায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দুঃস্থ শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য গড়ে তুলেছেন 'সারস্বত-একটি সামাজিক চেতনার উন্মেষ' নামে একটি সংগঠন। নিজেদের সব কাজের মধ্যেও তাঁরা চেষ্টা করছেন শিশুদের জন্য কিছু করতে। ১৯ সেপ্টেম্বর 'ইচ্ছাপূরণ' নামে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বহু দুঃস্থ শিশুর হাতে তাঁরা বস্ত্র ও নানা উপহার তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজ ফর উইমেন্সের অধ্যক্ষা ডঃ সোমা ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপিকা সুনন্দা ঘোষ।

পাঠকের মতামত

ভারতে বিদ্যালয় শিক্ষার হাল শোচনীয়

এ দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা যে অত্যন্ত করুণ তা বিশ্বব্যাঙ্কের সর্বশেষ রিপোর্টে (সেপ্টেম্বর,২০১৭) প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক শুধু ভারত নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলিতে শিক্ষার সংকটের কথা তুলে ধরেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই সব দেশে বিদ্যালয়ে ছাত্ররা প্রায় কিছুই শিখছে না, যা শিশুদের প্রতি অত্যন্ত অন্যায়। বিশ্বের লক্ষ লক্ষ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর ন্যূনতম মান অর্জন করে না— যা পরবর্তী শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। শিশুকালে বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষা না পাওয়ার ফলে এইসব দেশের লক্ষ লক্ষ শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে বহু সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় এবং স্বল্প বেতনে কাজ করতে বাধ্য হয়। এইসব দেশগুলির মধ্যে ভারতও আছে।

ভারতের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার এক শোচনীয় চিত্র তুলে ধরে 'ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০১৮ঃ 'লার্নিং টু রিয়েলাইজ এডুকেশনস প্রমিস'-এ বলা হয়েছে ১২টি দেশের মধ্যে মালয়ের পরই ভারত দ্বিতীয় স্থানে আছে যেখানে একজন দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র একটি ছোট অনুচ্ছেদের একটি শব্দও পড়তে পারে না এবং সাতটি দেশের মধ্যে ভারত প্রথম স্থানে আছে যেখানে একজন দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র দুই অংকের বিয়োগ করতে পারে না। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, যে গ্রামীণ ভারতে তৃতীয় শ্রেণির তিন চতুর্থাংশের মতো ছাত্র দুই অংকের বিয়োগ করতে পারে না, পঞ্চম শ্রেণির প্রায় অর্ধেক ছাত্রও তা করতে পারে না। এমনকী বিদ্যালয়ে কয়েক বছর পড়ার পরও লক্ষ লক্ষ ছাত্র পড়তে, লিখতে ও সামান্য অংক করতে পারে না। এতে আরও বলা হয়েছে, ২০১৬ সালে গ্রামীণ ভারতে পঞ্চম শ্রেণির মাত্র অর্ধেক ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্য বিষয়, যার মধ্যে স্থানীয় ভাষার বাক্য যেমন 'এটি বৃষ্টির মাস' বা 'আকাশে কালো মেঘ ছিল' অনর্গলভাবে পড়তে পারে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণির মধ্যম মানের ছাত্রদেরও প্রথম শ্রেণির উপযুক্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ৫০ শতাংশ, আর দ্বিতীয় শ্রেণির উপযুক্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর দেওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ৪০ শতাংশ। ২০১৫ সালে দেখা গেছে নতুন দিল্লিতে ষষ্ঠ শ্রেণির একজন মধ্যম মানের ছাত্র মাত্র তৃতীয় শ্রেণির অংক করতে পারে। এমনকী নবম শ্রেণির একজন মধ্যম মানের ছাত্র পঞ্চম শ্রেণির মানও অর্জন করতে পারেনি বলে দেখা গেছে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে ভাল ছাত্র এবং যে সব ছাত্র খুব খারাপ করছে তাদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছে। উপযুক্ত মান অর্জন করতে না পারলে শিক্ষা দারিদ্র দূর করতে এবং সকলের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে ও সমৃদ্ধি আনতে পারবে না। শিক্ষার এই দুরবস্থা সামাজিক বিভেদ কমানোর পরিবর্তে তা বাড়াচ্ছে। যে সব শিশু দারিদ্র, লিঙ্গ বৈষম্য প্রভৃতি কারণে পিছিয়ে তারা ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন না করেই বড় হয়।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টি, অসুস্থতা, বঞ্চনা, পিতা-মাতার থেকে বিশেষ সাহায্য না পাওয়া, দারিদ্র, আর্থসামাজিক বৈষম্য প্রভৃতি শিশুদের শিক্ষার প্রতিবন্ধক। রিপোর্টে শিক্ষকদের ভূমিকারও পর্যালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, শিক্ষকদেরও উপযুক্ত দক্ষতা ও প্রণোদনার অভাব রয়েছে। বিহারে মাত্র ১০.৫ শতাংশ শিক্ষক তিন অংকের সংখ্যাকে এক অংকের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে এবং তার ধাপগুলিকে দেখাতে পেরেছেন। শিক্ষকদের অনুপস্থিতি ও বিদ্যালয়গুলিতে স্বাধিকার না থাকাও শিক্ষার নিম্নমানের জন্য দায়ী বলে রিপোর্টে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভারতে শিক্ষার মানের নিম্নগামিতার যে সব কারণ রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সরকারি ও সরকরি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া, বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও পরিকাঠামোর অভাব, শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ। শিশু শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী এ দেশে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষা বলেছে এর ফলে শিক্ষার মানের অবনমন ঘটেছে।

ডঃ প্রদীপ দত্ত
প্রাক্তন প্রধান পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ

মৌলবাদে উস্কানি ভয়ঙ্কর বিপদ সৃষ্টি করছে

দেশ-বিদেশ জুড়ে কেমন যেন এক উন্মাদনা শুরু হয়েছে। মানুষ মানুষকে মারার উন্মত্ত খেলায় মেতে উঠেছে একবিংশ শতকের সভ্য আধুনিক সমাজ! ইন্ধন দিচ্ছে শাসকরাই। সম্প্রতি সোস্যাল মিডিয়াতে রোহিঙ্গা মুসলিমদের জ্যান্ত পুড়িয়ে বা কেটে ফেলার লাইভ ছবি দেখে গা শিউরে উঠছে। পশু জগতেও এ জিনিস চলে না। জাতিতে-জাতিতে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, ধর্মে-ধর্মে ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মায়ানমারে রোহিঙ্গা নিধনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী নাকি বলেছেন রোহিঙ্গা মুসলমানদের মতো এক দিন বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের তাড়াবেন। শুরু হয়ে যাচ্ছে প্রতিশোধ নেওয়ার উন্মত্ত খেলা। প্রতিটি দেশ যদি এই মারণ খেলায় মেতে ওঠে তা হলে শত্রু লাগবে না, মানুষই এই গর্বের মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করতে যথেষ্ট। জাত-পাত-সম্প্রদায়-ধর্ম তো মানুষই সৃষ্টি করেছে। কোনও অপরাধের জন্য সেই অপরাধীর বিশেষ সম্প্রদায়ের সবাইকে কেন চরম শাস্তি দেওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হবে? এ কেমন বিচার? এ সবের জন্য যারা মানুষকে মাতিয়ে দিচ্ছে তারা সংকীর্ণ রাজনীতি করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করছে ঠিকই কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ মানুষ যারা এই মারণ খেলায় মাথা ঢুকিয়ে দিচ্ছে তাদের কি আদৌ কিছু লাভ হবে?

মনে পড়ে যায় জার্মান কবি আর্নস্ট টলারের কথা। তিনি লিখেছিলেন, 'ওরা যখন ক্রিশ্চান ডেমোক্র্যাটদের ধরলে এল আমি কোনও কথা বলিনি—কারণ আমি তো ক্রিশ্চান ডেমোক্র্যাট নই। ওরা যখন সোস্যালিস্টদের ধরতে এল আমি কোনও কথা বলিনি—কারণ আমি তো সোস্যালিস্ট নই। আর ওরা যখন কমিউনিস্টদের ধরতে এল, আমি কোনও কথা বলিনি— কারণ আমি তো কমিউনিস্ট নই। ওরা যখন আমাকে ধরতে এল— তখন আমার হয়ে বলার মতো দেশে আর কেউ বেঁচে ছিল না'। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখবার সময় কিন্তু এসে গেছে। আমরা ভাবব কি?

কিংকর অধিকারী
বালিচক, পশ্চিম মেদিনীপুর

সমর্থকের জীবনাবসান

কলকাতার ভবানীপুরের এস ইউ সি আই (সি) সমর্থক ও অ্যাবেকার সদস্য আশিস সেন ১২ সেপ্টেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। ৮ অক্টোবর আশুতোষ ভবনে এক স্মরণসভায় তাঁর স্মৃতিতে বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস। সভাপতিত্ব করেন দলের কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শিবাজী দে।

ক্ষুধার্ত মানুষের 'বিকাশ' ঘটছে ভারতে

একের পাতার পর

নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, বাংলাদেশের থেকেও এই ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা খারাপ। এশিয়ার মধ্যে ভারত এগিয়ে আছে কেবলমাত্র আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের থেকে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইরাকের অবস্থাও ভারতের থেকে ভাল।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী সমীক্ষা করেই দেখা যাচ্ছে, এদেশের প্রায় ২১ কোটি মানুষ প্রতিদিন দু'বেলা পেট ভরা খাবারের সংস্থান করতে পারেন না। যদিও বাস্তব চিত্রটা যে আরও কত করুণ তা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতায় আছে। ভারতের ২১ শতাংশ শিশু অর্থাৎ প্রতি পাঁচজনে একজন শিশুর ওজন বয়সের তুলনায় কম। শতাংশের হারে গত দশ বছরে এই ধরনের শিশুর সংখ্যা এক শতাংশ বেড়েছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির নিরিখে দেখলে এই এক শতাংশ সংখ্যাটি কম নয়। বিশ্বের আর মাত্র চারটি দেশে এত কম ওজনের শিশু দেখা যায়। যার অন্যতম হল আফ্রিকার দিবৌতি, দক্ষিণ সুদান, রোয়ান্ডার মতো চূড়ান্ত দারিদ্র পীড়িত দেশ।

সমীক্ষকরা দেখিয়েছেন, এদেশের এক-তৃতীয়াংশ শিশুর বৃদ্ধি তাদের বয়সের তুলনায় অনেক কম। যে বয়সে শিশু মাতৃদুগ্ধের উপর সম্পূর্ণনির্ভরতা ছেড়ে অন্যান্য খাদ্য খেতে শুরু করে, ভারতে ঠিক সেই ৬ মাস বয়সী শিশুর প্রায় অর্ধেক (৪২.৭ শতাংশ) উপযুক্ত খাদ্য পায় না। ফলে তারা চূড়ান্ত অপুষ্টিতে ভোগে এবং তাদের বৃদ্ধি আটকে যায়। আরও খারাপ অবস্থা তার পর থেকে দুই বছর (৬ থেকে ২৩ মাস) পর্যন্ত শিশুদের, এই বয়সের শিশুদের ৯০ শতাংশই অপুষ্টিজনিত খর্বতার শিকার। শিশুদের বৃদ্ধি এবং তাদের স্বাস্থ্যের সাথে পুষ্টিকর খাদ্যের পাশাপাশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পর্যাপ্ত জায়গা সহ বাসস্থান এবং পারিবারিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। সমীক্ষা দেখিয়েছে এ দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ পরিবারের উপযুক্ত বাসস্থান নেই। স্থায়ী কাজ এবং একই স্থানে দীর্ঘদিন বসবাসের মতো স্থিতিশীলতা নেই। ফলে যারা খাদ্য পাচ্ছে তেমন শিশুরাও নানা রোগের শিকার হয়ে অপুষ্টিতে ভুগছে। বিরাট সংখ্যক পরিবারের সন্তানকে উপযুক্ত ভাবে প্রতিপালনের মতো রোজগার দূরে থাকুক প্রতিদিন দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোটানোরও সংস্থান নেই। ভারতের পরিস্থিতিকে সমীক্ষকরা উদ্বেগজনক সীমারও বেশ খারাপের দিকেই রেখেছেন। অথচ বিগত ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে এদেশে আইসিডিএসের মতো প্রকল্প চালু আছে। যে দল যখন সরকারে এসেছে তারাই শিশুদের বিকাশ নিয়ে গলা ফাটিয়েছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এখন নরেন্দ্র মোদি সরকারের বেশি মাথাব্যথা হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে বুলেট ট্রেন চালু করাতে। তাদের উৎসাহ শত শত কোটি টাকা খরচ করে বল্লভভাই প্যাটেল, শিবাজি কিংবা রামের দৈত্যাকার মূর্তি বসানোয়। এই এক-একটা মূর্তির খরচেই বহু শিশুর অপুষ্টি দূর হতে পারত। কিন্তু বিজেপি সরকার চমকের ঝকমকানিতে চাপা দিতে চাইছে দেশের চরম অন্ধকারকে। বিজেপির রাজত্বে এক বছরে আম্বানিদের লাভ বেড়েছে ৬৭ শতাংশ, আজিম প্রেমজিদের লাভ বেড়েছে ৫ গুণ। আর ২০১৪ থেকে তিন বছরে ভারত নেমেছে ক্ষুধা সূচকের ৪৫ থেকে ১০০ তম স্থানে। লজ্জার সেঞ্চুরি করেছে ভারত। যদিও নরেন্দ্র মোদির মতো ধুরন্ধর ভোটবাজ থেকে শুরু করে রাহুল গান্ধিরা পর্যন্ত এতেই অবশ্য 'আশার আলো' দেখেন। কারণ এই দারিদ্র পীড়িত ক্ষুধার্ত মানুষের দিকে ভোটের সময় দু'মুঠো খুদ-কুঁড়ো ছুঁড়ে দিয়ে তাদের ভোট কেনা সহজ হয় যে!

গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্সের এই সমীক্ষায় ধরা পড়েছে উন্নয়নশীল ১১৯টি দেশের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই আছে উদ্বেগজনক স্থানে। দুনিয়ার প্রায় ৭০০ কোটি জনসংখ্যার ২০০ কোটির বেশি মানুষ পুরোপুরি তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য পান না। এর মধ্যে ৮০ কোটি চূড়ান্তভাবে ক্ষুধার্ত। অন্যদিকে বিশ্বে উৎপন্ন খাদ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অপচয় হয়। এর আগে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে মার্কিন সংস্থা অক্সফ্যামের সমীক্ষা দেখিয়েছিল পৃথিবীর সাড়ে তিনশো কোটি লোকের মোট সম্পদের সমান সম্পদ আছে মাত্র ৮ জন ধনকুবেরের জিম্মায়। ভারতে ৭০ শতাংশ লোকের সম্পদের সমান সম্পদ কুক্ষিগত আছে মাত্র ৫৮ জন ধনকুবেরের হাতে।

শত শত উন্নয়নের ফানুস ওড়ানো, আর্থিক বিকাশ ইত্যাদি নানা স্বপ্ন দেখানোর পরেও আজ এই ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে মানুষের রেহাই নেই কেন? কোথায় আছে এই সমস্যার সমাধান? এ প্রশ্ন মানুষকে ভাবাচ্ছে। ভারত সামরিক ক্ষেত্রে নাকি সুপারপাওয়ার হয়ে উঠছে। অন্যদিকে দেশে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা। সারা দুনিয়ার পরিস্থিতিই তাই। এই ক্ষুধা মেটানোর কোনও দায় আজ শাসক পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের নেই। রাজনৈতিক ক্ষমতাই খাদ্যের অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করছে। গবেষকরা দেখেছেন, কয়েকটি বড় সংস্থা এবং একদল বিত্তবানদের স্বার্থে খাদ্যনীতি ঠিক হচ্ছে দেশে দেশে। খাদ্যে ভর্তুকি, খাদ্য সুরক্ষার নানা কথা বললেও দেশে দেশে সরকারগুলি আসলে ঘুরপথে কৃষিপণ্যের বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিকে বাজার পাইয়ে দেওয়াতেই বেশি উদগ্রীব। অথচ ক্ষুধা অপুষ্টিকে একদিন দুনিয়ার একটা বিরাট অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিদায় করেছিল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সেই সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতি আজ সাম্রাজ্যবাদীদের এতটা বেপরোয়া করে তুলেছে যে, আগে বুর্জোয়ারা অন্তত শ্রমিককে বাঁচিয়ে রেখে পরের দিন কাজে আসার মতো খাবার জোগাড়ের জন্য যতটা মজুরি দিতে রাজি ছিল, আজ তারা সেটুকু দেওয়ারও তোয়াক্কা করে না। জানে হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ একটা কাজ, দু'চার টাকা রোজগারের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরছে। কোনও আবেদন নিবেদন, কাকুতি মিনতি দিয়ে এই সাম্রাজ্যবাদীদের হৃদয় গলানো যাবে না। একমাত্র পথ হল খাদ্য নিয়ে মুনাফা করার এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে নতুন করে সমাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তার পরিপূরক গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা। নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে ডোনাল্ড ট্রাম্প— শাসকের নাম আজ যাই হোক এই পুঁজিপতিদের সেবা-দাসদের থেকে মানুষের আজ কিছুই পাওয়ার নেই।

লুডভিগের সাথে সাক্ষাৎকারে স্ট্যালিন

তিনের পাতার পর

আপনি বেঁচে আছেন। এটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? আপনি কি ভাগ্যে বিশ্বাস করেন?

স্ট্যালিন ঃ না, করি না। বলশেভিকরা, মার্কসবাদীরা ভাগ্যে বিশ্বাস করে না। ভাগ্যের ধারণা হল একটা সংস্কার, একটা অলীক বিষয়, পুরনো ধারণারঅবশেষ। প্রাচীন গ্রীক পুরাণে যেমন এক দেবীর কথা আছে, মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন।

লুডভিগ ঃ অর্থাৎ আপনার মারা না যাওয়াটা একটা আপতিক বিষয়?

স্ট্যালিন ঃ আমি যে মারা যাইনি তার অনেক বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কারণ আছে। ...ভাগ্য হল এমন বিষয় যা রহস্যময়, যা প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। আমি তো রহস্যবাদে বিশ্বাস করি না। বিপদ কেন আমায় অক্ষত রেখে গেল তার অবশ্যই কারণ আছে। কিন্তু অন্যান্য কারণে উদ্ভূত এমন সব পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারত, যার ফলে আমার মৃত্যুও হতে পারত। এ ব্যাপারে তথাকথিত ভাগ্যের কোনও ভূমিকা নেই।

লুডভিগ ঃ লেনিন অনেকদিন বিদেশে নির্বাসনে কাটিয়েছেন। আপনি একবার খুব অল্প সময়ের জন্য প্রবাসে থেকেছেন। আপনি কি মনে করেন, এতে আপনার কিছুটা অসুবিধা হয়েছে? কাদের আপনি বিপ্লবের পক্ষে মহত্তর কল্যাণকর বলে মনে করেন— যাঁরা প্রবাসে নির্বাসনে কাটিয়ে ইউরোপের সামগ্রিক নিরীক্ষার সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু অপরদিকে জনগণের প্রত্যক্ষ সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন— তাঁদের, না কি যে সব বিপ্লবী এখানেই কাজ করেছেন, জনগণের মানসিকতা জেনেছেন, কিন্তু অপরদিকে ইউরোপ সম্পর্কে জেনেছেন সামান্যই, তাঁদের?

স্ট্যালিন ঃ তুলনামূলক এই বিচার থেকে অবশ্যই লেনিনকে বাদ দিতে হবে। দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকা সত্ত্বেও বাস্তব পরিস্থিতি ও শ্রমিক আন্দোলনের সাথে লেনিনের যেমন নিবিড় যোগাযোগ ছিল, দেশের ভিতরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে খুব কম লোকেরই এমন যোগাযোগ ছিল।প্রবাসে যখন তাঁকে দেখেছি— সেই ১৯০৬, ১৯০৭, ১৯১২ এবং ১৯১৩ সালে— তখন জেনেছি, তিনি রাশিয়ার বাস্তব কাজের সাথে যুক্ত পার্টিকর্মীদের কাছ থেকে অসংখ্য চিঠি পেয়েছেন এবং যাঁরা রাশিয়ার ভিতরে থাকেন, তাঁদের চেয়েও সবসময় আরও বেশি ওয়াকিবহাল থেকেছেন। প্রবাস জীবনকে সবসময় তিনি একটা বোঝা বলে মনে করতেন।

এমন অসংখ্য কমরেড আছেন, যাঁরা কখনও বিদেশে যাননি। তাঁরা কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে কাজ করে প্রবাসী বিপ্লবীদের চাইতেও অনেক বেশি অবদান রাখতে পেরেছেন। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের পার্টিতে বর্তমানে খুব অল্প সংখ্যক প্রবাসী নির্বাসিত বিপ্লবী আছেন। দলের কুড়ি লক্ষ সদস্যের মধ্যে তাঁরা বড়জোর সংখ্যায় একশো বা দু'শো। কেন্দ্রীয় কমিটির সত্তর জন সদস্যের মধ্যে বড়জোর তিন-চার জন প্রবাসে ছিলেন।

আর যদি ইউরোপ নিরীক্ষার কথা বলা হয়, তবে যাঁরা সেখানে ছিলেন তাঁরা নিঃসন্দেহে বেশি সুযোগ পেয়েছেন। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে যাঁরা বেশিদিন বিদেশে থাকেননি তাঁরা খানিকটা হারিয়েছেন। কিন্তু ইউরোপের অর্থনীতি, প্রযুক্তি, শ্রমিক আন্দোলন এবং বিজ্ঞান ও রসসাহিত্য অধ্যয়নের জন্য বিদেশবাস অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত নয়। অন্য সব কিছু এক থাকলে ইউরোপে বসে ইউরোপ অধ্যয়ন সহজতর। কিন্তু যাঁরা ইউরোপে বাস করেননি, তাঁদের খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। পক্ষান্তরে, আমি এমন অনেক কমরেডকে জানি, যাঁরা কুড়ি বছর একটানা বিদেশে ছিলেন। শালনটেনবার্গ বা লাতিন কোয়ার্টারে বাস করেছেন, কাফেতে বিয়ার পান করে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন —তবুও ইউরোপ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে, তাকে বুঝতে পারেননি।

লুডভিগ ঃ আপনি কি মনে করেন না, জাতি হিসাবে স্বাধীনতাপ্রিয়তার চেয়েও শৃঙ্খলাপ্রিয়তা জার্মানদের মধ্যে অনেক বেশি লক্ষ করা যায়?

স্ট্যালিন ঃ একটা সময় ছিল যখন জার্মান জনগণ আইনের প্রতি বিরাট মর্যাদা দেখিয়েছিল। ১৯০৭ সালে আমি যখন বার্লিনে দু-তিনমাস কাটিয়েছিলাম, তখন আমরা রুশ বলশেভিকরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধার জন্য কোনও কোনও জার্মান বন্ধুদের ঠাট্টা করতাম। একটা গল্প চালু ছিল। বার্লিন সোস্যাল ডেমোক্রেটিক কর্মকর্তারা সমস্ত শহরতলি সংগঠনগুলির সংগঠকদের জমায়েতের জন্য একটা দিন ও সময় ধার্য করেছিল। ২০০ জনের একটা দল শহরতলি থেকে নির্দিষ্ট সময়ে শহরে এসেছিল, কিন্তু জমায়েতে হাজির থাকতে পারেনি। কারণ, যেহেতু, বাইরে যাওয়ার গেটে কোনও টিকিট কালেক্টর হাজির ছিল না। টিকিট নেওয়ার মতো কেউ ছিল না— তাই তারা দু'ঘণ্টা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করেছিল। ঠাট্টা করে বলা হয়, জার্মান কমরেডদের সমস্যা থেকে উদ্ধার করতে এক রুশ কমরেডকে সহজ পথ বাতলানোর জন্য এগিয়ে এসে বলতে হয়েছিল— টিকিট জমা না দিয়েই প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যাও।

কিন্তু এখনও কি জার্মানির অবস্থা সেরকম? আজকের জার্মানিতে কি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা আছে? বুর্জোয়া আইন রক্ষায় যাদের অগ্রণী বলা হয়, সেই ন্যাশনাল সোস্যালিস্টদের অবস্থা কী? তারা কি আইন ভাঙছে না? শ্রমিকদের সংগঠন ধ্বংস করছে না? শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে শ্রমিকদের খুন করছে না?

আমি শ্রমিকদের কথা বলছি না। আমার মনে হয় তারা অনেক আগেই বুর্জোয়া আইনের প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা হারিয়েছে। হ্যাঁ, জার্মানরা আজকাল অনেক বদলে গেছে।

লুডভিগ ঃ কোন কোন পরিস্থিতিতে একটা পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণিকে চূড়ান্ত ও সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব?

কমিউনিস্টদের বক্তব্য অনুযায়ী একমাত্র সর্বহারা বিপ্লবের পরই শ্রমিক শ্রেণিকে ওইভাবে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। কেন?

স্ট্যালিন ঃ কমিউনিস্ট পার্টির চারপাশে শ্রমিক শ্রেণিকে ওইভাবে ঐক্যবদ্ধ করার কাজটি বিজয়ী সর্বহারা বিপ্লবের ফল হিসাবে খুব সহজেই সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু বিপ্লবের অনেক আগে এই ঐক্য নিঃসন্দেহে মূলত অর্জন করা যাবে।

লুডভিগ ঃ উচ্চাশা কি একজন মহান ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে তাঁর কাজের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে, না ক্ষতি করে?

স্ট্যালিন ঃ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে উচ্চাশার ভূমিকা ভিন্ন ভিন্ন। একজন মহান ঐতিহাসিক ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে উচ্চাশা উদ্দীপক বা প্রতিবন্ধক দুই-ই হতে পারে। এ সবই নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর। প্রায়শই তা বাধা হয়ে থাকে।

লুডভিগ ঃ অক্টোবর বিপ্লব কি এক অর্থে মহান ফরাসি বিপ্লবের ধারাবাহিকতা ও পরিণতি?

স্ট্যালিন ঃ অক্টোবর বিপ্লব মহান ফরাসি বিপ্লবের নিরন্তর প্রবাহ বা পরিণতি— কোনওটাই নয়। ফরাসি বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সামন্তবাদকে উৎখাত করা। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের উদ্দেশ্য হল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ধনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করা।

(স্ট্যালিন ঃ ... এবার, প্রত্যুত্তরে, দয়া করে আমাকে আদেশ দিন আপনাকে একটা অবিনয়ী প্রশ্ন করার। সত্যি বলতে কি, এটা ঠিক কোনও প্রশ্ন নয়, একটা প্রস্তাব। আপনি এর উত্তর না-ও দিতে পারেন। কিন্তু যদি এর উত্তর 'হ্যাঁ'-তে দেন তা হলে, কোনও অবস্থাতেই, যেন কেউ কখনও না জানতে পারে আমি আপনাকে এই প্রশ্ন করেছি।

লুডভিগ ঃ আমি আপনাকে আগাম কথা দিচ্ছি, আমি রাজি।

স্ট্যালিন ঃ আপনি কি এই কথোপকথন প্রকাশ করবেন?

লুডভিগ ঃ সাক্ষাৎকার হিসাবে নয়, তবে অবশ্যই কোনও না কোনওভাবে, ভবিষ্যতে যখন আমি আপনার সম্পর্কে লিখব।

স্ট্যালিন ঃ এর জন্য কি আপনি কোনও সাম্মানিক পাবেন?

লুডভিগ ঃ হ্যাঁ

স্ট্যালিন ঃ আপনি কি সেই সাম্মানিকের কিছু অংশ চাকরি হারানো জার্মান শ্রমিকদের সন্তানসন্ততিদের উন্নতিকল্পে নিবেদিত একটি ফান্ডে দান করতে ইচ্ছুক? তবে অবশ্যই এ-কথা একেবারে উল্লেখ না করে যে, আমি আপনাকে এমনটা করতে বলেছিলাম।

লুডভিগ ঃ আগামী ক'ই প্তার মধ্যেই মিঃ ইয়ুম্যানস্কি আমার কাছ থেকে ১০০০ মার্কের একটি দরপত্র পাবেন। এটা আমি খুশি মনেই দেব। কিন্তু আপনি কি একবার ভেবে দেখবেন না এটা আমাকে আপনার প্রকাশ্যে বলা সম্ভব কি-না? হাজার হাজার মানুষ, যারা হয় আপনাকে মনে করেন নিষ্ঠুর জার বা দয়ালু ডাকাত, এতে কিন্তু তাদের চোখে আপনার ভাবমূর্তি সম্পর্কে দারুণ উজ্জ্বল ছবি

জীবনাবসান

দলের প্রবীণ সদস্য ও সর্বক্ষণের কর্মী উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাত লোকাল কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড কমল মল্লিক দুরারোগ্য ক্যান্সারে দীর্ঘ রোগভোগের পর ৬ অক্টোবর ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল ও বারাসাতের কর্মী-সমর্থক-দরদি ও বহু সাধারণ মানুষ দলের জেলা দপ্তরে চলে আসেন। লোকাল কমিটির অফিস সংলগ্ন স্থানে উপস্থিত নেতা-কর্মী-সাধারণ মানুষ ও তাঁর আত্মীয়স্বজন কমরেড মল্লিকের মরদেহে মাল্যদান করেন।

প্রয়াত কমরেড কমল মল্লিক ১৯৮০ সালে নদীয় জেলার চাপড়া থানার অন্তর্গত নিজের গ্রাম ফুলকলমীতে দলের কাজ শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কর্মসূত্রে উত্তর ২৪ পরগণায় থাকা শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি ব্যক্তিগত কাজ ছেড়ে দিয়ে বারাসাত লোকাল পার্টি অফিসে থেকে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন। তখন থেকেই আজীবন দলের অফিসের টালির ছোট ঘরে স্থায়ীভাবে থেকেই দলের ঝজকর্ম করেছেন। জীবনের শেষ দুই বছর তীব্র অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে জেলা পার্টি অফিসে নিয়ে আসা হয়।

দলের কাজ তিনি খুব যত্ন নিয়ে করতেন। যতটুকু দায়িত্ব নিতেন একশো ভাগ পালন করার চেষ্টা করতেন। দীর্ঘ ৩৭ বছরের সংগ্রামী জীবনে তিনি অনেক দরিদ্র সাধারণ মানুষ ও পরিবারকে দলের চিন্তার সাথে যুক্ত করেছেন। নিজের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও দলের আদর্শ নিয়ে গেছেন। জীবনের শেষ তিন-চার বছর গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সিপিডিআরএস-এর নেতৃত্বে কাজ করেছেন। অসুস্থ শরীরেও তিনি সিপিডিআরএস-এর রাজ্য ও জেলা মিটিংগুলিতে অংশ নিতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর অতি সাধারণ জীবন যাপনের মধ্য দিয়েই বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও অসাধারণ প্রভাব ফেলতে পেরেছিলেন।

১১ অক্টোবর বারাসাতে কমরেড কমল মল্লিকের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় তাঁর সংগ্রামী জীবনের স্মৃতিচারণা করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শংকর ঘোষ।

কমরেড কমল মল্লিক লাল সেলাম

পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালডি থানার ইছর গ্রামের দলের প্রবীণ আবেদনকারী সদস্য কমরেড দয়াল বাউরী হাঁপানি সহ আরও কিছু দুরারোগ্য ব্যাধিতে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই আক্রান্ত হন। চিকিৎসায় সাময়িক সুস্থ হলেও হঠাৎ রোগের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় ২৪ আগস্ট বাড়িতেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে পরের দিন ভোর থেকেই নেতা-কর্মীরা তাঁর বাড়িতে যান। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মদন চ্যাটার্জী ও অন্যান্য স্থানীয় নেতারা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

৭০-এর দশকে শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র অন্তর্গত কোল লেভিং লেবার ইউনিয়নের নেতৃত্বে ন্যায্য মজুরি ও স্থায়ী কাজের দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে কমরেড দয়াল বাউরী তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দলের সাথে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে স্থানীয় স্তর থেকে শুরু করে রাজ্য স্তরের আন্দোলনগুলিতেও তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকত। ২০০৫ সাল নাগাদ শারীরিক অসুস্থতা শুরু হয়। যতদিন চলাফেরা করতে পারতেন ততদিন কাজের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও কমরেডদের কাছে আবেদন রেখেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরও যেন তাঁর বাড়িতে কমরেডদের যাতায়াত থাকে। খুবই দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ না পেলেও দলের মুখপত্র গণদাবী ও পুস্তিকা খুঁটিয়ে পড়ার চেষ্টা করতেন। গত ৯ সেপ্টেম্বর গ্রামের মূল সড়ক মড়পতলে ব্যাপক অংশের মানুষের উপস্থিতিতে জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড ডি কে মুখার্জির সভাপতিত্বে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড দয়াল বাউরী লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

ন্যায্য দামে পাট কেনার দাবি

এ আই কে কে এম এস-এর

ন্যূনতম ৮০০০ টাকা কুইন্টাল দরে পাট কেনার দাবিতে ২২ সেপ্টেম্বর জেসিআই-এর রাজ্য দপ্তরে স্মারকলিপি দিল অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজদুর সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড শেখ খোদাবক্সের নেতৃত্বে পাঁচ জনের প্রতিনিধিদল ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের কাছে জবাব চান পাটের ভরা মরশুমে কেন জেসিআই পাট কিনতে নামল না? তাঁরা দাবি জানান, পঞ্চায়েত স্তরে পর্যাপ্ত ক্রয়কেন্দ্র খুলে সরাসরি চাষির কাছ থেকে নগদ মূল্যে পাট কিনতে হবে। তাঁদের আরও দাবি, পাটের সহায়ক মূল্য নির্ধারণে কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের মতামত নিতে হবে। রাজ্য সম্পাদক কমরেড পঞ্চানন প্রধান প্রতিনিধি দলে ছিলেন।

অটো ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ দক্ষিণ ২৪ পরগণায়

দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোচরণ বিষ্ণুপুর রুটে অস্বাভাবিক হারে অটোভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১১ অক্টোবর পদ্মের হাটে ও বহড়ু কলুর মোড়ে (ছবিতে) এসইউসিআই (সি)-র পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ১৪ অক্টোবর সরবেড়িয়াতে রাস্তা অবরোধ করা হয়। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন কমরেডস সহদেব কয়াল, সুবীর দাস, দিব্যেন্দু মুখার্জি, সুমন্ত গাঙ্গুলি, ইলিয়াস মোল্লা, সওকাত মোল্লা, চিন্ত হালদার, মফিজ মোল্লা, কলিক জলুয়া প্রমুখ। বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বিডিও, ওসি, বিধায়ক এবং অটো ইউনিয়নকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে।

মহান নভেম্বর বিপ্লব শতবর্ষ

ভোপালে ডিএসও-র আলোচনা সভা

১০ অক্টোবর ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ভোপালে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন ডিএসও-র রাজ্য সভাপতি কমরেড মুদিত ভাটনগর। এদেশের মুক্তিকামী সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে ছাত্রসমাজকে, রাশিয়ার মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষাগুলি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কেন চর্চা করতে হবে এবং সেই শিক্ষার আলোকে বর্তমান সময়ে আরও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বিশ্লেষণের পথে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, তা আলোচনা করেন ডিএসও-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু, ক্ষতিপূরণের দাবি জানাল অ্যাবেকা

খিদিরপুরের একবালপুর এলাকার হুশেন শাহ রোডে ৯ অক্টোবর মাসুদ আলম নামে এক ব্যক্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান। অ্যাবেকার দাবি, কলকাতা পৌরসভা ও সিইএসসির দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে। অ্যাবেকার আরও বক্তব্য, ১৯ জুন খিদিরপুরে আরও দুজন এভাবে মারা গেলেও তদন্ত করে কোনও প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়েছে।

ছত্তিশগড়ে শহিদস্মরণ

২৮ সেপ্টেম্বর শহিদ-ঈ-আজম ভগৎ সিং-এর জন্মদিবস উপলক্ষে দুরগ-এর শহিদ চকে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও এবং অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে শহিদ স্মরণ কর্মসূচি পালিত হয়। শহিদ চকে স্থাপিত চন্দ্রশেখর আজাদ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, উধম সিং ও ভগৎ সিং-এর মূর্তিতে মাল্যদান করার পর সেখানে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা নেতৃবৃন্দ। স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচিতে বিপ্লবীদের জীবনসংগ্রাম সঠিকভাবে যুক্ত করার দাবিতে তাঁরা সোচ্চার হন।

দিল্লিতে মেট্রো রেলের ভাড়া বৃদ্ধিতে বিক্ষোভ

দিল্লিতে মেট্রো রেলের ভাড়া দু'দফায় প্রায় একশো শতাংশ বৃদ্ধির প্রতিবাদে এ আই ইউ টি ইউ সি এবং এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে ১১ অক্টোবর আজাদপুর মেট্রো স্টেশন থেকে শুরু হয়ে এক বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন স্থানে পথসভা করেন।

মদ বন্ধের দাবিতে ছত্তিশগড়ে মিছিল-সমাবেশ

২ অক্টোবর দুরগ-এর রাজেন্দ্র পার্কের সমাবেশ থেকে রাজ্যে সম্পূর্ণভাবে মদ নিষিদ্ধ করার জোরালো দাবি জানাল ছত্তিশগড়ের সাধারণ মানুষ। 'ছত্তিশগড় রাজ্য শরাববিরোধী সংঘর্ষ সমিতি', অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন, অল ইন্ডিয়া ডি এস ও, অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও-র মিলিত উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সমাবেশের পর সেখান থেকে বিশাল মিছিল বেরিয়ে শহর পরিক্রমা করে।

উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের পুনর্বাসনের দাবিতে সর্দার সরোবর বাঁধ উদ্বোধনের দিনে বিক্ষোভ

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের পাশাপাশি ১৪২টি গ্রামের প্রায় ৪০ হাজার উচ্ছেদ হওয়া মানুষের পুনর্বাসনের দাবিতে মধ্যপ্রদেশে ব্যাপক গণআন্দোলন চলছে। এর বিরুদ্ধে গত ৩১ জুলাই রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালন করে এসইউসিআই(সি)। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৩ সেপ্টেম্বর ভোপালে কৃষক ও উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের যুক্ত সম্মেলন, ১৪-১৫ সেপ্টেম্বর বিশাল বিক্ষোভ মিছিল, ১৭ সেপ্টেম্বর সর্দার সরোবর বাঁধ উদ্বোধনের দিনে রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়।

গৌরী লঙ্কেশ ঃ হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে দিল্লিতে যৌথ মিছিল

বিশিষ্ট সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ হত্যার এক মাস পূর্তিতে ৫ অক্টোবর দিল্লির মান্ডি হাউস থেকে যন্তরমন্তর পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বাম দল, প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব, প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিসমূহের দ্বারা আয়োজিত এই মিছিলে এস ইউ সি আই (সি)-র দিল্লি রাজ্যের সব গণসংগঠন অংশগ্রহণ করে। গৌরী স্মরণে সঙ্গীত পরিবেশন করেন এ আই ইউ টি ইউ সির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি কমরেড আর কে শর্মা। এস ইউ সি আই (সি) দিল্লি রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রাণ শর্মা গৌরী লঙ্কেশ, কুলবার্গি, পানসারে, দাভেলকর হত্যার পিছনে বিজেপি-আর এস এস এর বিদ্বেষমূলক উগ্র রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২ বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org